ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির)- ০১

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين

أما بعد...

আল্লাহ তাআলা অপরাধের বিপরীতে শাস্তির বিধান দিয়েছেন। যেন মানুষ শাস্তির ভয়ে অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় কেউ অপরাধে লিপ্ত হলে তার উপর যথার্থ শাস্তি কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন। যাতে অপরাধী দ্বিতীয়বার অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস না পায়। জনগণ যেন তার শাস্তি দেখে শিক্ষা নেয়। এভাবে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল হবে। সমাজের স্বাভাবিক ভারসাম্যতা বজায় থাকবে। সমাজে শান্তি ও সুশৃংখলতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে এই শাস্তি সবক্ষেত্রে এক রকম নয়। অপরাধের ধরণ ও পরিমাণ, অপরাধীর অবস্থা, যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে তার অবস্থা- ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্নতায় শাস্তির ধরণ-প্রকৃতি ও পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

এক. অপরাধের ভিন্নতায় শাস্তির ভিন্নতা

যেমন:

- যিনার শাস্তি: বিবাহিত হলে রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা আর অবিবাহিত হলে একশো দোররা।
- কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দিলে আশি দোররা।
- মদপানে আশি দোররা।
- চুরি করলে হাত কাটা।
- রাহাজানি করলে অবস্থাভেদে হত্যা, শূলিতে চড়ানো, কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া, কিংবা জেলে ভরা বা নির্বাসন দেয়া।
- হত্যার বদলে হত্যা বা দিয়াত (রক্ত-মূল্য)।
- মুরতাদ হয়ে গেলে হত্যা।

দুই. অপরাধীর অবস্থাভেদে শাস্তির ভিন্নতা

যেসব অপরাধের শাস্তি শরীয়তে সুনির্ধারিত নয় (যেমন- পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, কাউকে গালি দেয়া), সেসব অপরাধের শাস্তি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- কোন দ্বীনদার ব্যক্তি যদি জীবনের প্রথম কাউকে গালি দেয়, তাহলে তাকে

মাফ করে দেয়া যেতে পারে। যেমনটা হাদিসে এসেছে- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود "বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হদ ব্যতীত অন্যান্য ভুল-বিচ্যুতি মাফ করে দাও।" কিংবা তাকে যদি কাযি সাহেব লোক মারফত জানান যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে: আপনি অমুককে গালি দিয়েছেন- তাহলে এতটুকুই তার এ অপরাধের শাস্তির জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি গালি-গালাজ এবং মারামারিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, লোকজন তার যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে যায়- তাহলে এমন ব্যক্তিকে মাফ করা হবে না। তাকে শুধু মৌখিক জানানোও যথেষ্ট নয়। বরং তাকে গ্রেফতার করে কাযির দরবারে হাজির করতে হবে। প্রয়োজনে প্রহার করতে হবে। জেলে আটকে রাখতে হবে, যত দিন না তাওবা করে সংশোধন হয়। তদ্রূপ কোন দ্বীনদার ব্যক্তি যদি কোন নিরপরাধ মুসলমানকে মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেলে, তাহলে জীবনের প্রথমবার করলেও তার এ অপরাধ ক্ষামাযোগ্য নয়। তাকে শুধু জানানোও যথেষ্ট নয়। বরং তাকে প্রয়োজন পরিমাণ বেত্রাঘাত করাই এখন তার যোগ্য শাস্তি। কেননা, তার এ অপরাধ আর ভুল-বিচ্যুতির পর্যায়ে থাকেনি (হাদিসে যা ক্ষমা করে দেয়ার কথা এসেছে) বরং তা মাত্রা অতিক্রম করে সীমালংঘন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

তিন. যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে, তার অবস্থাভেদে শাস্তির ভিন্নতা

কোন সাধারণ লোক যদি অন্য কোন সাধারণ লোককে গালি দেয়, তাহলে তার শাস্তি হবে এক রকম। পক্ষান্তরে এমন ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট আলেমকে গালি দিলে তার শাস্তি হবে আরও শক্ত। তদ্রূপ কোন নষ্টা মেয়ের সাথে ইভটিজিং করার শাস্তির তুলনায় কোন সম্ভ্রান্ত, দ্বীনদার ও পর্দানশীল নারীর সাথে এ ধরণের কর্মের শাস্তি আরও গুরুতর হবে। এভাবে অপরাধ ও অপরাধী এক হওয়া সত্ত্বেও যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে, তার অবস্থাভেদে শাস্তি ভিন্ন হয়।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০২

হদ (الحد)-তা'যির (التعزير)

শরীয়তে শাস্তি ও দণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত:

১. কিছু শাস্তি শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত, যাতে কোন ধরণের কম-বেশ করা যাবে না। এগুলোকে হদ বলে। আর কিছু

শাস্তির সুনির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। অপরাধের ধরণ ও পরিমাণ, অপরাধীর অবস্থা, যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে তার অবস্থা- ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্নতায় সেগুলো বিভিন্ন রকম ও পরিমাণের হয়ে থাকে। শরয়ী ইমাম, সুলতান বা কাযি যেখানে শরীয়ত সম্মত যে ধরণের ও যে পরিমাণের শাস্তি দেয়া মুনাসিব মনে করেন, ইজতিহাদের ভিত্তিতে সে রকম শাস্তি প্রয়োগ করবেন। যেখানে যে শাস্তি প্রয়োগ করলে অপরাধ দমন হবে বলে মনে হয়, সেখানে সে শাস্তিই প্রয়োগ করবেন। অবশ্য তা শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত শাস্তি তথা হদের কম হতে হবে। এ ধরণের শাস্তিকে তা'যির বলে। নিচে আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে হদ ও তা'যির নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

হদ (الحد)

আভিধানিকভাবে الحد অর্থ- المنع তথা বাধা দেয়া। এসব শাস্তিকে হদ বলা হয়, কারণ- এগুলো লোকজনকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে। লোকজন যখন জানবে যে- যিনা, কযফ (তথা কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমানকে

যিনার অপবাদ দেয়া), চুরি ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়তে নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে, তখন সচরাচর তারা এসব অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস করবে না। কেউ এসব অপরাধের কোন একটাতে লিপ্ত হলে যখন তার উপর এর শাস্তি কায়েম করা হবে তখন সে আর পুনর্বার তাতে লিপ্ত হতে সাহস করবে না। তদ্রূপ জনসাধারণ যখন অপরাধীর উপর এসব শাস্তি কায়েম হচ্ছে দেখবে, তখন তারাও এগুলোতে লিপ্ত হওয়ার সাহস করবে না। মোটকথা- এসব শাস্তি লোকজনকে এসব অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে এগুলোকে হদ বলা হয়।

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

الحد في اللغة : عبارة عن المنع ... وفي الشرع : عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى - عز شأنه . اهـ

"অভিধানে হদ অর্থ- বাধা দেয়া। ... আর শরীয়তের পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি।" **[বাদায়িউস সানায়ে': ৫/৪৮৬]**

ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.) বলেন,

الحد في اللغة المنع ... وسميت العقوبات الخالصة حدودا لأنها موانع من ارتكاب أسبابها معاودة. اهـ

“অভিধানে হদ অর্থ- বাধা দেয়া। ... খালেস শাস্তিসমূহকে হদ বলা হয় কারণ, যেসব কারণে এসব শাস্তি বর্তায়, এগুলো পুনর্বার সেগুলোতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।” **[আলবাহরুর রায়েক: ৫/৩]**

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

تحقيق العبارة ما قال بعض المشايخ: إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده. أي: العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه. اهـ

“তাহকিকি কথা হচ্ছে যা কোন কোন মাশায়িখ বলেছেন যে, ‘লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এগুলো (লিপ্ত হওয়া থেকে) বাধা দান করে আর লিপ্ত হওয়ার পর (পুনর্বার লিপ্ত হওয়া থেকে) বারণ রাখে।’ অর্থাৎ শরীয়তে এসব শাস্তির বিধান রয়েছে বলে জানা থাকাটা সেগুলোতে লিপ্ত হতে বাধা দেয়, আর লিপ্ত হওয়ার

পর এগুলো প্রয়োগ করাটা সেগুলোতে পুনর্বার লিপ্ত হওয়া থেকে বারণ রাখে।” **[ফাতহুল কাদির: ৫/১৯৬]**

হদের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে:

১. عقوبة তথা শাস্তি।

২. مقدرة তথা সুনির্ধারিত।

৩. حقا لله تعالى তথা আল্লাহ তাআলার হক।

অতএব, হদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস থাকবে-

প্রথমত তা শাস্তি হবে। কাজেই নামায, রোযা- ইত্যাদির কাফফারা সুনির্ধারিত হলেও সেগুলো হদ নয়। কেননা সেগুলো খালেস শাস্তি নয়। সেগুলোতে ইবাদত ও শাস্তি উভয় দিকই রয়েছে।

দ্বিতীয়ত শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত হবে। এ শর্তের দ্বারা তা'যিরসমূহ হদের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা, সেগুলো শাস্তি হলেও শরীয়ত কতৃক সেগুলোর ধরণ ও পরিমাণ সুনির্ধারিত নয়। বরং অবস্থাভেদে তা বিভিন্ন রকম হয়।

তৃতীয়ত তা আল্লাহ তাআলার হক হবে। আল্লাহ তাআলার হক হওয়ার অর্থবান্দাদের কেউ সেগুলো মাফ করতে পারবে না। অর্থাৎ উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর কেউ সেগুলো মাফ করতে পারবে না। ইমামুল *মুসলিমীনেরও সে অধিকার, নেইঅন্য কারও সে অধিকার নেই। যেমন- চার সাক্ষী দিয়ে কাযির দরবারে যিনা প্রমাণ হওয়ার পর যিনাকারকে মাফ করার কোন সুযোগ নেই। বিবাহিত হলে রজম করতে হবে আর অবিবাহিত হলে একশো দোররা লাগাতে হবে।

(আল্লাহর হক ও বান্দার হক নিয়ে সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা আসবে।)

এ শর্তের দ্বারা হদের সংজ্ঞা থেকে কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা বেরিয়ে যাবে। কেননা হত্যার বদলে হত্যা যদিও সুনির্ধারিত, কিন্তু সেটা বান্দার হক। নিহত ব্যক্তির অভিবাবকগণ ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যা না করে বা দিয়াত না নিয়ে মাফও করে দিতে পারেন। কিন্তু হদ তার ব্যতিক্রম। প্রমাণ হওয়ার পর তা মাফ করার কোন সুযোগ

নেই।

কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

وفي الشرع : عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى - عز شأنه - بخلاف التعزير فإنه ليس بمقدر ، قد يكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرهما ، وبخلاف القصاص فإنه وإن كان عقوبة مقدرة لكنه يجب حقا للعبد ، حتى يجري فيه العفو والصلح. اهـ

"শরীয়তের পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি। কিন্তু তা'যির এমন নয়। কেননা, সেটা সুনির্ধারিত না। কখনো প্রহারের দ্বারা হয়, কখনো বন্দী করে রাখার দ্বারা হয় আবার কখনো অন্য কিছু দিয়ে হয়। তদ্রূপ কেসাসও এর ব্যতিক্রম। কেননা, সেটা সুনির্ধারিত শাস্তি হলেও তা বান্দার হক হিসেবে ফরয হয়। ফলে তাতে মাফ করে দেয়া কিংবা (বিনিময় নিয়ে) চুক্তি করা চলে।" **[বাদায়িউস সানায়ে': ৫/৪৮৬]**

মুহাম্মাদ থানবী হানাফী রহ. (১১৫৮হি.) বলেন,

وعند الفقهاء: عقوبة مقدرة تجب حقّا لله تعالى. فلا يسمّى القصاص حدّا لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير. والمراد بالعقوبة هاهنا ما يكون بالضرب أو القتل أو القطع فخرج عنه الكفّارات، فإنّ فيها معنى العبادة والعقوبة. اهـ

“ফুকাহায়ে কেরামে পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি। কাজেই কেসাসকে হদ বলা হয় না। কেননা, সেটা বান্দার হক। তা’যিরকেও না। কারণ, সেটা সুনির্ধারিত নয়। এখানে শাস্তির দ্বারা উদ্দেশ্য- যা প্রহার, হত্যা বা কর্তনের মাধ্যমে হবে। কাজেই কাফফারাসমূহ এ থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা, সেগুলোতে ইবাদত-শাস্তি উভয় দিকই রয়েছে।” **[কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলূম: ১/৬২৩]**

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির)- ০৪

২. কযফ তথা যিনার অপবাদ আরোপ

কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমান নারী বা পুরুষের উপর যিনার অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারীকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। অপবাদ আরোপকারীকে চার জন আদেল

সাক্ষী দিয়ে যিনা প্রমাণ করতে বলা হবে। যদি প্রমাণ না করতে পারে তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। আর হানাফি মাযহাব মতে ভবিষ্যতে সারা জীবনের জন্য তার সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা বাতিল হয়ে যাবে। তাই আর কখনোও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

"যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসতে পারে না: তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসেক। তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজদের সংশোধন করে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" নূর: ৪-৫

মুনাফিকরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা

আনহার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করেছিল। তিন জন সরল-সহজ মুসলমানও তাদের ফাঁদে পড়ে তাদের সাথে তাল মিলিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে সূরা নূরের শুরুর দিকে দশটি আয়াত নাযিল করে উম্মুল মু'মিনীনের পবিত্রতা ঘোষণা করেন। সেখানে অপবাদ আরোপকারীদেরকে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}

"তারা এ বিষয়ে কেন চার জন সাক্ষী উপস্থিত করল না? যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ তাআলার নিকট তারা নিজেরাই মিথ্যাবাদি।" নূর: ১৩

আয়াত নাযিল হওয়ার পর যেসব মুসলমান অপবাদে শরীক ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হদ্দে কযফস্বরূফ আশি করে বেত্রাঘাত লাগান। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্: কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল কযফ।]

হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যিনায় লিপ্ত হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك.

"চার সাক্ষী উপস্থিত কর, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ বর্তাবে।" [নাসায়ী, বাব: কাইফাল লিআন। আরও দেখুন- তিরমিযি: তাফসীরে সূরা নূর; আবু দাউদ, বাব: ফিল-লিআন।]

কযফ কিভাবে প্রমাণ হবে?

সাক্ষী বা অপবাদ আরোপকারীর নিজ স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যিনার মতো চার পুরুষ বা চার বার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। দুই জন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা অপবাদ আরোপকারীর এক বার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। অর্থাৎ দুই জন আদেল পুরুষ যদি কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক পূত-পবিত্র মুসলমানকে যিনাকারী বলেছে কিংবা ব্যক্তি যদি নিজেই কাযির কাছে স্বীকার করে যে, সে অমুক পূত-পবিত্র মুসলমানকে যিনাকারী বলেছে তাহলেই সে অপবাদ

আরোপকারী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এখন যদি সে চার জন সাক্ষী দিয়ে যিনা প্রমাণ না করতে পারে, তাহলে হদ্দে কযফরূপে তাকে আশিটি বেত লাগানো হবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রেও মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৩-৪. মদ পান ও মাদক সেবন

এ উভয়টির শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। তবে মদের ক্ষেত্রে কম পান করুক কি বেশি পান করুক, নেশা আসুক বা না আসুক- সর্বাবস্থায় হদ লাগানো হবে। আর মদ ব্যতীত অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি এ পরিমাণ সেবন করে যে, যার কারণে নেশা এসে গেছে- তাহলে হদ লাগানো হবে, অন্যথায় নয়। তবে হদ না লাগানোর অর্থ এই নয় যে, তা সেবন করা জায়েয। সেবন সর্বাবস্থায়ই নাজায়েয। তবে হদ কায়েমের জন্য নেশা আসা শর্ত। কিন্তু মদের ক্ষেত্রে নেশা আসা শর্ত নয়। মদ পান করাই হদ কায়েমের জন্য যথেষ্ট, নেশা আসুক বা না আসুক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পানকারীকে চল্লিশ বেত লাগাতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এর উপরই

আমল করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় যখন লোকজনের মাঝে মদ পানের পরিমাণ বেড়ে গেল, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন- কি করা যায়? সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে আশি বেত্রাঘাত শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হয়।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পক্ষে এই যুক্তি দেন যে, হদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল- আশি বেত্রাঘাত। কেননা, যিনার শাস্তি একশো দোররা আর হদ্দে কযফের শাস্তি আশি দোররা। এর নিচে কোন হদ নেই। তিনি বলেন, এ সর্বনিম্ন হদকেই মদ পানের শাস্তি নির্ধারণ করা হোক।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন ব্যক্তি মদ পান করলে মাতাল হয়ে যায়। মাতাল হলে বেহুদা কথা-বার্তা ও গালি-গালাজ শুরু করে। গালি-গালাজের এক পর্যায়ে কাউকে যিনার অপবাদও আরোপ করতে পারে। আর এর শাস্তি আশি দোররা। অতএব, মদ পান যেহেতু কযফ তথা অপবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে, তাই এর শাস্তি কযফের শাস্তির অনুরূপ হতে পারে। এ পরামর্শদ্বয় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পছন্দ হল।

অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও তাতে সম্মতি দিলেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরামের সম্মতির ভিত্তিতে মদ্য পানের শাস্তি নির্ধারিত হয় আশি বেত্রাঘাত। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল খমর, বাব: আয-যারবু বিলজারিদি ওয়াননিআল; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল খমর; মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, বাব: আলহদ্দু ফিলখমর।]

মদ্যপান কিভাবে প্রমাণ হবে?

হদ্দে কযফের মতোই দুই জন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা মদ্যপানকারী নিজের স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণ হবে। তবে স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে শর্ত হলো- তা স্বাভাবিক হুঁশ থাকা অবস্থায় হতে হবে। মাতাল অবস্থায় যদি স্বীকার করে যে, সে মদপান করেছে তাহলে তা ধর্তব্য নয়।

এ দুই ত্বরীকা ভিন্ন মদ্যপান প্রমাণিত হওয়ার আর কোন ত্বরীকা নেই। কাজেই কারো ঘরে বা দোকানে বা কারো সাথে যদি মদ পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর মদ্যপানের হদ কায়েম করা যাবে না। তবে তার কাছে মদ পাওয়া যাওয়ার কারণে মুনাসিব মতো অন্য শাস্তি দেয়া হবে।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৬: তা'যিরের প্রকারভেদ ও পরিমাণ

তা'যির(التعزير)

আভিধানিকভাবেতা'যিরের**(التعزير)**কয়েকটাঅর্থআসে।তবেফিকহশাস্ত্রেরপারিভাষিকঅর্থেরসাথেসবচেয়েসামঞ্জস্যপূর্ণঅর্থহলো- التأديبতথাশিষ্টাচারশিক্ষাদানওমন্দকাজেরশাস্তিপ্রদানএবং المنع তথা নিবৃত্ত রাখা;চাইতাপ্রহারেরমাধ্যমেহোকবাঅন্যকোনভাবেহোক।তদ্রূপপ্রহারবাশাস্তিরপরিমাণকমওহতেপারে, বেশিওহতেপারে।এরনির্ধারিতকোনসীমানেই।

আরফিকহশাস্ত্রেরপরিভাষায়তা'যিরবলে, শরীয়তেযেসবঅপরাধেরশাস্তিসুনির্ধারিতনয়, সেসবঅপরাধেরবিপরীতেপ্রদত্তশাস্তি। ইমামুল মুসলিমীন, সুলতান বা কাযি- অপরাধ, অপরাধী ও অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় শরীয়ত সম্মত যে শাস্তি নির্ধারণ করেন, সেটাই তা'যির। তবে শরীয়তের বিধান হলো, তা'যিরের পরিমাণ হদের চেয়ে কম হতে হবে। যেমন, অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা

করলে তার উপর হদ্দে যিনারূপে একশোত বেত্রাঘাত বর্তাবে। এখন যদি কোন অবিবাহিত ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে চুম্বন, জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি কুকর্ম করে কিন্তু সঙ্গম করতে পারেনি- তাহলে তার শাস্তি কি হবে তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। এক্ষেত্রে কাযি সাহেব মুনাসিব মতো শাস্তি দেবেন। তবে তার পরিমাণ হদ্দে যিনা তথা একশো বেত্রাঘাতের চেয়ে কম হতে হবে। তবে একশোর কমে সর্বোচ্চ কত দিতে পারবেন, তাতে আইম্মায়ে কেরামের মতভেদ আছে। তা'যিরের পরিমাণের আলোচনায় তা আসবে ইনশাআল্লাহ্। এবার ফুকাহায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ করুন:

ইবনে কুদামা মাকদিসি রহ. (৬২০হি.) বলেন,

التعزير : هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ... يسمى تعزيرا لأنه منع من الجناية. والأصل في التعزير المنع. اهـ

“তা'যিরহচ্ছেসেসবঅপরাধেরবিপরীতেপ্রদত্তশরয়ীশাস্তি, যেগুলোতেহদআসেনা। ... তা'যিরকেতা'যিরবলাহয়কারণ, তাঅপরাধথেকেনিবৃত্তরাখে।তা'যিরেরমূলঅর্থ- নিবৃত্তরাখা।” [আলমুগনী: ১০/৩৪২]

‘আদ-দুররুলমুখতারে’ বলাহয়েছে,

(هو) لغة التأديب مطلقا... وشرعا (تأديب دون الحد). اهـ

“তা’যিরেরআভিধানিকঅর্থ-
শিষ্টাচারশিক্ষাদানএবংমন্দকাজেরবিপরীতেশাস্তিপ্রদান,
চাইতাযেভাবেইহোক, যেপরিমাণইহোক। …
আরশরীয়তেরপরিভাষায়তা’যিরবলে,
হদেরচেয়েকমপরিমাণেরশাস্তিকে।”

আল্লামাইবনেআবেদীনশামীরহ. (১২৫২হি.)
এরব্যাখ্যায়আভিধানিকঅর্থকেআরোপরিষ্কারকরেতুলেছেন।তিনিব
লেন,
(قوله هو لغة التأديب مطلقا) أي بضرب وغيره دون الحد أو أكثر
منه. اهـ“…
অর্থাৎতাপ্রহারেরমাধ্যমেহোকবাঅন্যকিছুরমাধ্যমেহোক।হদেরচে
য়েকমহোকবাবেশিহোক।” [রদ্দুলমুহতার: ৪/৫৯]

ফাতাওয়ায়েহিন্দিয়া-তেএসেছে,
هو تأديب دون الحد ويجب في جناية ليست موجبة للحد. اهـ
“তা’যিরবলেহদেরচেয়েকমপরিমাণেরশাস্তিকে।যেসবঅপরাধেহদ
ফরযহয়না, সেসবঅপরাধেতা’যিরআবশ্যকহয়।” [
আলফাতাওয়ালহিন্দিয়া: ২/১৬৭]

ইসলামে তা’যিরের পরিধি অনেক বিস্তৃত

শরীয়তে হদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট কয়েকটি। হানাফি মাযহাব মতে হদ ছয়টি। দ্বিতীয়ত হদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য অনেক শর্ত নির্ধারিত আছে, যেগুলো পেরিয়ে হদ কমই প্রমাণিত হয়। কোন শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে যখন হদ কায়েম করা যায় না, তখন তা’যির করতে হয়। অপর দিকে হদের বাহিরে অপরাধের সংখ্যা ও ধরণ অনেক। আবার একেক অপরাধীর অবস্থাও একেক রকম। এসবের হিসেবে তা’যিরের ধরণ, প্রকৃতি ও পরিমাণও বিভিন্ন রকম হয়। তাই শরীয়তে তা’যিরের পরিধি অনেক বিস্তৃত। একটি ইসলামী রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এবং সব ধরণের অপরাধ দমন করে শান্তি-শংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ তা’যির কায়েম করার ভূমিকা তুলনাহীন।

তা’যিরের প্রকারভেদ ও পরিমাণ

তা’যিরের সংজ্ঞায় আমরা দেখেছি, তা’যির হচ্ছে এমন শাস্তি যা শরীয়তে হদের মতো সুনির্ধারিত নয়; বরং অপরাধ, অপরাধী, পারিপার্শ্বিকতা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় এর

ধরণ ও পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যাকে যে পরিমাণ শাস্তি দিলে সে অপরাধ থেকে বিরত হবে, সেটাই তার তা'যির। তবে এ শাস্তির পরিমাণ হদের চেয়ে কম হতে হবে, যেমনটা সংজ্ঞায় বলা হয়েছে। তবে কারো যদি অপরাধ অনেক হয়ে থাকে, আর সবগুলোর সম্মিলিত শাস্তি হদের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে তাতে অসুবিধা নেই। কারণ, এখানে প্রত্যেকটা শাস্তি মূলত হদের চেয়ে কম। কিন্তু অপরাধ বেশি হওয়ায় সামষ্টিকভাবে সেগুলো হদের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে।

তা'যিরের শাস্তি সুনির্ধারিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কাযি বা সুলতান যাকে যেমন ইচ্ছা মন মতো শাস্তি দিয়ে দেবেন। এটা কখনোই উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো- কাযি সাহেব প্রত্যেক ব্যক্তির বেলায় সার্বিক দিক বিবেচনা করে দেখবেন, তাকে কি পরিমাণ শাস্তি দিলে সে বিরত হবে। যে প্রকার শাস্তি দিলে বিরত হবে বলে মনে করেন, সে প্রকার ব্যতীত অন্য প্রকারের শাস্তি দেয়া জায়েয হবে না। তদ্রূপ, যে পরিমাণে বিরত হবে বলে মনে করেন, সে পরিমাণের চেয়ে বেশি দেয়াও জায়েয হবে না। যে চোখ রাঙানীর দ্বারাই বিরত হয়ে যাবে মনে হয়, তাকে প্রহার করা যাবে না। যে প্রহারের দ্বারাই বিরত হয়ে যাবে, তাকে জেলে দেয়া যাবে না। আবার

যে দশ বেত্রাঘাতেই বিরত হয়ে যাবে, তাকে বিশটা লাগানো জায়েয হবে না। অতএব, তা'যিরের বিষয়টা কাযি সাহেবের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল, খাহেশাতের উপর নয়।

ইবনে দাকিকুল ঈদ রহ. (৭০২হি.) বলেন,

وليس التخيير فيه ، ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة : تخيير تشه ، بل لا بد عليهم من الاجتهاد . اهـ

"তা'যিরে কিংবা কর্তৃত্বশীলদের নিকট সোপর্দ এমন কোন বিষয়েই কোন একটা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়ার অর্থ নিজ খাহেশাত মতো বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া নয়। বরং তাদের উপর আবশ্যক- ইজতিহাদ করা।" [ইহকামুল আহকাম: ৩/১৪৪, কিতাবুল হুদুদ]

তা'যিরের শাস্তি কোন এক প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়

উপরের আলোচনা থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, তা'যির কোন এক প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়। এমন নয় যে, সকল অপরাধের শাস্তি শুধু প্রহারের দ্বারা কিংবা জেলের দ্বারাই দিতে হবে। বরং অবস্থাভেদে শাস্তির প্রকার বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেখানে যে

প্রকার উপযুক্ত, সে প্রকারই প্রয়োগ করবে।

কুরআন হাদিসে বিভিন্ন প্রকারের তা’যিরের কথা এসেছে। ফুকাহায়ে কেরাম তা’যিরে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(চলবে ইনশাআল্লাহ্)

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির)- ০৭: এক. বয়কট ও বর্জন

কুরআন হাদিসে বিভিন্ন প্রকারের তা’যিরের কথা এসেছে। ফুকাহায়ে কেরাম তা’যিরে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. বর্জন ও বয়কট।

২. নির্বাসন।

৩. বন্দী করে রাখা।

৪. প্রহার।

৫. হত্যা … ইত্যাদি।

এক. বর্জন ও বয়কট

কেউ কোন হারাম কাজে লিপ্ত হলে কিংবা কোন ফরয-ওয়াজিব ছেড়ে দিলে, মুনাসিব মনে হলে তাকে বর্জন ও বয়কটের মাধ্যমে তার শাস্তি হতে পারে। কুরআনে কারীমে স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর ব্যাপারে এই শাস্তির কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

"যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেনো- আল্লাহ সবার উপরে, সবার বড়।" [নিসা: ৩৪]

বুঝিয়ে কাজ না হলে আল্লাহ তাআলা অবাধ্য স্ত্রীর বিছানা স্বামী থেকে আলাদা করে দিতে বলেছেন। এতেও কাজ না হলে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। এটা তার অবাধ্যতার শাস্তি।

এ আয়াতে কারীমাটি তা'যিরের অধ্যায়ে একটি মৌলিক দলীলরূপে বিবেচ্য। এখান থেকে কয়েকটি বিধান জানা যায়:

- হুকুকুল্লাহ বা হুকুকুল ইবাদ- এর যে কোনটার সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ, যেগুলোর কারণে সমাজে বিশৃংখলা বা সমাজের লোকজনের কষ্ট হতে পারে, সেগুলোর বিপরীতে তা'যির করা যাবে। কেননা, স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে তা'যিরের অধিকার দিয়েছেন; অথচ স্ত্রীর অবাধ্যতার কষ্ট শুধু স্বামী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, তাহলে যেসকল অপরাধের কারণে সমাজ নষ্ট হবে, জনগণের কষ্ট হবে; সেগুলোর কারণে তো এর আগেই শাস্তি জায়েয হবে, যাতে অপরাধী দমন হয় এবং সমাজে বিশৃংখলা না হয়, লোকজন কষ্ট থেকে রেহাই

পায়।

- তা'যিরের ক্ষেত্রে ক্রমানুবর্তিতা গ্রহণ করতে হবে। অল্পতে কাজ হলে বেশি দেয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রথমেই বিছানা পৃথক করার কিংবা প্রহার করার বৈধতা দেননি। প্রথমে বুঝাতে বলেছেন। কাজ না হলে তখন বিছানা পৃথক করতে বলেছেন। তাতেও কাজ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। এই ক্রমানুবর্তিতার বিধান সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

وهو مشروع بالكتاب، قال الله تعالى {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34] أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا. اهـ

"তা'যিরের বৈধতা কুরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, [তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে,

তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না।] শিষ্টাচার ও সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদের প্রহার করার আদেশ দিয়েছেন।" [ফাতহুল কাদির: ৫/৩৪৫]

ইবনুল উখুওয়্যাহ্‌ রহ. (হি.৭২৯) বলেন,

ولأن الله - تعالى - أباح الضرب للزوج عند نشوز الزوجة وقسنا عليه سائر المعاصي على حسب ما يراه الإمام أو نائبه. اهـ

"তাছাড়া স্ত্রীর অবাধ্যতায় আল্লাহ তাআলা স্বামীকে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। অন্য সকল অপরাধকে আমরা এর উপর কিয়াস করতে পারি। ইমাম বা তার নায়েব যেমনটা মুনাসিব মনে করেন, শাস্তি দেবেন।" [মাআলিমুল ক্বুরবাহ্‌: ১/২৫০]

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

إذا خاف نشوزها وعظها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع فإن قبلت وإلا ضربها. اهـ

"যখন স্ত্রীর থেকে অবাধ্যতার আশঙ্কা করবে- তাকে বুঝাবে। যদি গ্রহণ করে তো ভালই, অন্যথায় তাকে বিছানায় পরিত্যাগ

করবে। যদি গ্রহণ করে তো ভালই, অন্যথায় প্রহার করবে।” [আহকামুল কুরআন: ২/২৩৮]

হাদিস শরীফেও বয়কটের নজীর রয়েছে। গযওয়ায়ে তাবুকে তিনজন সাহাবী শরীক হননি। তারা হলেন- কা’ব ইবনে মালেক রাদি., হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদি. ও মুরারাহ্ ইবনে রবী’ রাদি.। সাহাবায়ে কেরামসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাদেরকে পঞ্চাশ দিন বয়কট করে রেখেছিলেন। পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের তাওবা কবুল করে তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا { رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}

“এবং সেই তিন জনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন) যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হয়েছিল। অবশেষে যখন

এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠল এবং তারা উপলব্ধি করল- আল্লাহর পাকড়াও থেকে স্বয়ং তার আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না: তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে তারা তারই দিকে মনোনিবেশ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [তাওবা: ১১৮]

ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (হি.৬৫৬) বলেন,

(قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا - أيها الثلاثة -) هو دليل على وجوب هجران من ظهرت معصيته ، فلا يسلم عليه إلا أن يقلع وتظهر توبته . اهـ

"কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম লোকজনকে আমাদের তিন জনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন' এটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত হবে, তাকে বর্জন করা ফরয। কাজেই তাকে সালাম দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হয় এবং তার মাঝে তাওবা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।" [আলমুফহিম:

২২/১৩৫]

তাদের ঘটনা বিস্তারিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে দেখা যেতে পারে।

তদ্রূপ বেদআতীদেরকেও বর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের বিদআত পরিত্যাগ করে এবং লোকজন তাদের গোমরাহি থেকে সতর্ক ও নিরাপদ থাকতে পারে।

বি.দ্র.

এই প্রকারের বর্জন ও বয়কট ঐ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মুসলিমকে তিন দিনের অধিক বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন- হযরত আবু আইয়ূব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

[لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام]

"কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তিন দিনের অধিক তার (দ্বীনি মুসলিম) ভাইকে পরিত্যাগ করে চলবে যে, দু'জন দেখা হয়ে গেলে সেও মুখ ফিরিয়ে নেবে, সেও মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো- যে আগে সালাম দেবে।" [সহীহ বুখারী ৬২৩৭, সহীহ মুসলিম ৬৬৯৭]

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৮: দুই নির্বাসন

দুই. নির্বাসন

কোন অপরাধীর বেলায় যদি মনে হয়, তাকে অন্যত্র নির্বাসন দিলে একাকিত্বের যাতনায় কিংবা নির্বাসিত এলাকার নেক পরিবেশে থেকে সে সংশোধন হয়ে যাবে, তাহলে তাকে অন্যত্র নির্বাসন দেয়া যেতে পারে। এতে এক দিকে সে নিজে সংশোধন হবে, অন্য দিকে লোকজন তার অনিষ্ট থেকে রেহাই পাবে।

এই নির্বাসনের কথা কুরআন ও হাদিসে এসেছে। আল্লাহ তাআলা রাহজানদের শাস্তির ব্যাপারে বলেন,

{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যমিনে ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে- তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে ওদের নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়াতে ওদের লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" [মায়েদা: ৩৩]

অনেকের মতে এখানে أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ দ্বারা নির্বাসন উদ্দেশ্য।

হাদিসে অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্তিতে এক বৎসরের নির্বাসনের কথা এসেছে। মুসলিম শরীফে হযরত উবাদা ইবনে

সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)

"অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে যিনা করলে তার শাস্তি: একশো বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন।" [সহীহ মুসলিম: ১৬৯০]

বুখারী শরীফে এসেছে,

عن زيد بن خالد الجهني قال: (سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام)

"হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিবাহিত যিনাকারীকে একশো বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন দেয়ার আদেশ দিতে শুনেছি।" [সহীহ বুখারী: ৬৪৪৩]

অন্য হাদিসে এসেছে- এক লোক এক বাড়িতে কর্মচারি ছিল।

সে বাড়ির মালিকের স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর হদ কায়েম করেন। কর্মচারি লোকটি অবিবাহিত ছিল তাই তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেন। আর মালিকের স্ত্রী বিবাহিত হওয়ায় তাকে রজম করে হত্যা করেন। [সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতিল্লাতি লা তাহিল্লু ফিলহুদুদ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।]

সাহাবায়ে কেরাম থেকেও নির্বাসনের ঘটনা বর্ণিত আছে। তবে আমাদের আইম্মায়ে কেরামের মতে এগুলো হদ হিসেবে নয়, তা'যির হিসেবে। অতএব, যার ক্ষেত্রে উপযোগী মনে হয়, তাকেই শুধু নির্বাসন দেয়া হবে; যাকে নির্বাসন দিলে তার নিজের বা অন্যদের ফিতনার আশঙ্কা আছে, তাকে নির্বাসন দেয়া যাবে না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এমনই বর্ণিত আছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (৫৯৩হি.) বলেন,

" إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى"
وذلك تعزير وسياسة لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي
فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة
رضي الله عنهم. اهـ

"তবে যদি ইমামুল মুসলিমীন নির্বাসন দেয়াতে মাসলাহাত রয়েছে মনে করেন, তাহলে যত দিন মুনাসিব মনে করেন নির্বাসন দিতে পারেন। এটি হবে তা'যির ও সিয়াসতরূপে। কেননা, কোন কোন অবস্থায় এটি উপকারী হয়। কাজেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভার ইমামের উপর ন্যাস্ত। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কারো কারো থেকে বর্ণিত নির্বাসন দেয়ার ঘটনাকে এর উপরই প্রয়োগ করা হবে।" [আলহিদায়া: ২/১৮৪]

আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

(قوله ويكون بالنفي عن البلد) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر
ونفي عمر - رضي الله عنه - نصر بن حجاج لافتتان النساء

بجماله وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذى الناس ينفى عن البلد. اهـ

“দুররে মুখতার গ্রন্থকারের বক্তব্য [নিজ জনপদ থেকে নির্বাসন দেয়ার মাধ্যমেও তা’যির হতে পারে।]- অবিবাহিত যিনাকারীকে নির্বাসন দেয়ার কথা যা আগে গেছে, সেটা এর মধ্যেই পড়ে। নসর ইবনে হাজ্জাজের সৌন্দযের কারণে মহিলারা যখন ফিতনার শিকার হচ্ছিল, তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নির্বান দিয়েছিলেন। এটাও এর মধ্যেই পড়ে। আননাহরুল ফায়েক্বে আইনী প্রণীত বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি লোকজনকে কষ্ট দেবে, তাকে নিজ জনপদ থেকে অন্যত্র নির্বাসন দিয়ে দেয়া হবে।” [রদ্দুল মুহতার: ৪/৬৪]

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

وفعل الصحابة محمول على أنهم رأوا ذلك مصلحة على طريق التعزير ، ألا يرى أنه روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه نفى رجلا فلحق بالروم فقال : لا أنفي بعدها أبدا .

وعن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال : كفى بالنفي فتنة؛ فدل أن فعلهم كان على طريق التعزير ، ونحن به نقول : إن للإمام أن

ينفي إن رأى المصلحة في التغريب ، ويكون النفي تعزيرا لا حدا. اهـ

“সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত নির্বাসন দেয়ার ঘটনা এর উপর প্রয়োগ হবে যে, তা’যিররূপে তারা তা উপকারী মনে করেছেন। আপনি কি দেখেন না- হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নির্বাসন দিলে সে রোমানদের সাথে গিয়ে মিলে যায়। তখন তিনি বলেন, ‘এরপর আর কখনও আমি নির্বাসন দেব না।’

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘ফিতনার জন্য নির্বাসনই যথেষ্ট।’ অতএব, বুঝা গেল- তারা তা করেছেন তা’যিররূপে। আমরাও এ অভিমত পোষণ করি যে, যদি মাসলাহাত মনে করেন, তাহলে ইমামুল মুসলিমীন নির্বাসন দিতে পারেন। এ নির্বাসন হবে তা’যির, হদ না।” [বাদায়িউস সানায়ি’: ১৫/৫২]

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ০৯- তিন-চার. বন্দী ও প্রহার

তিন. বন্দী করে রাখা

এখানে জেলে বন্দী বা নিজ গৃহে নজরবন্দী উভয়টাই উদ্দেশ্য। কুরআন সুন্নাহয় এ উভয়টাই এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}

"তোমাদের নারীদের মধ্য হতে যারা অশ্লীল কাজ করবে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী রাখবে। তারা সাক্ষ্য দিলে সেসকল নারীকে গৃহে বন্দী করে রাখবে, যাবৎ না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা দেন।" [নিসা: ১৫]

ইসলামের শুরু যামানায় যিনার নির্ধারিত কোন শাস্তি ছিল না। সে সময়ে ব্যবস্থা ছিল- যিনায় লিপ্ত নারীদের গৃহে বন্দী করে রাখা। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। অবিবাহিতদের জন্য একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিতদের

জন্য রজম করে হত্যা নির্ধারিত হয়েছে।

এ আয়াত যদিও মানসূখ হয়ে গেছে, তবে এ থেকে এতটুকু বুঝে আসে যে, যেসকল অপরাধের জন্য শরীয়তে নির্ধারিত কোন শাস্তি নেই, সেসবের ক্ষেত্রে বন্দী করে রাখা একটা শাস্তি হতে পারে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] قد يستدل بذلك على أن المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী: [সেসকল নারীকে গৃহে বন্দী করে রাখবে, যাবৎ না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা দেন।] এ থেকে এ বিষয়ে দলীল দেয়া যায় যে, অপরাধীর ব্যাপারে যদি শরীয়তের বিধান জানা না যায়, তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে আটক করে বন্দী করে রাখা হবে। বিধান জানা গেলে তখন বাস্তবায়ন করা হবে।” [আলফাতাওয়াল কুবরা: ৫/৫২৭]

এক হাদিসে এসেছে,

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه)

“হযরত বাহয ইবনে হাকিম তার পিতৃসূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন- অভিযোগের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন। এরপর (নির্দোষ প্রমাণিত হলে) তাকে ছেড়ে দেন।” [তিরমিযি: ১৪১৭, আবু দাউদ: ৩৬৩০]

সাহাবায়ে কেরাম থেকে বন্দী করে রাখার অজস্র ঘটনা বর্ণিত আছে।

চার. প্রহার

প্রহার তা’যিরের অত্যধিক প্রসিদ্ধ পন্থা। বরং তা’যির বলতে যেন সাধারণত প্রহারকেই বুঝিয়ে থাকে। কুরআন সুন্নাহয় প্রহারের দ্বারা তা’যিরের কথা এসেছে। খুলাফায়ে রাশিদিনসহ পরবর্তী সকল যুগে প্রহারের মাধ্যমে তা’যিরের ধারা চলে আসছে।

কুরআনে কারীম থেকে সূরা নিসার পূর্বোল্লিখিত ৩৪ নং আয়াত এর দলীল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

“যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেনো- আল্লাহ সবার উপরে, সবার বড়।” [নিসা: ৩৪]

এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أَبناءُ سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشْر ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع)

“তোমাদের সন্তানরা যখন সাত বৎসরে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে নামাজের আদেশ কর। আর দশ বৎসরে উপনীত হলে তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের

বিছানা আলাদা করে দাও।” [আবু দাউদ: ৪৯৫]

এখানে নাবালেগকে নামায তরক করার কারণে প্রহারের আদেশ দেয়া হয়েছে, অথচ নাবালেগের উপর শরীয়তের বিধি বিধান বর্তায় না; তাছাড়া নামায না পড়ার দ্বারা শুধু ব্যক্তির নিজেরই ক্ষতি হয়, অন্যের ক্ষতি হয় না। তাহলে বালেগ ব্যক্তিদের এবং ঐ সকল অপরাধ, যেগুলোর দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয় বা হক নষ্ট হয়- সেগুলোতে এর আগেই প্রহার বৈধ হবে।

অন্য হাদিসে এসেছে,
(لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)
“আল্লাহ তাআলার কোন হদ ভিন্ন অন্য কোথাও দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না।” [সহীহ বুখারী: ৬৪৫৬]

এখানে হদ দ্বারা গুনাহ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ গুনাহ নয় এমন বিষয়ে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না। অর্থাৎ আদব-কায়দা ও সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বৈধ রীতি-নীতির বিপরীত করলে, যদি তা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহের পর্যায়ে না পড়ে, তাহলে বেত্রাঘাত করা যাবে, তবে দশের অধিক নয়।

আর কোন গুনাহে লিপ্ত হলে তখন মুনাসিব মতো দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে।

এক হাদিসে এসেছে, নিজ স্ত্রীর বাঁদিকে বৈধ মনে করে সহবাস করলে একশো বেত্রাঘাত লাগানো হবে। [সহীহ বুখারী: ২২৯০, মুসনাদে আহমাদ: ১৪৫১]

কুরআনে কারীমের মুতাশাবিহ আয়াত নিয়ে ফিতনা সৃষ্টির অপরাধে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের সাবিগ ইবনে ইসলকে পেটাতে পেটাতে রক্তাক্ত করেছেন। [সুনানে দারেমী: ১৪৪] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে দুইশত বেত্রাঘাত করেছেন। [মুসনাদে বাযযার: ২৯৯]

মোটকথা: প্রহারের দ্বারা তা'যির বৈধ। তবে এর সর্বোচ্চ পরিমাণ কত হবে তা নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। সামনে এর আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির); ১০; পাঁচ. হত্যা

তা’যিরের পঞ্চম প্রকার: হত্যা

পাঁচ: হত্যা

হত্যার মাধ্যমেও তা’যির হতে পারে। সাধারণত একে القتل سياسةً তথা সিয়াসতরূপে হত্যা বলা হয়। কুরআন সুন্নাহয় তা’যিররূপে হত্যার নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}

“কাউকে হত্যা বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতীতই কেউ কাউকে হত্যা করলে, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল।” - মায়েদা: ৩২

এ আয়ত থেকে বুঝা যায়, কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা যাবে। তদ্রূপ কেউ পৃথিবীতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা করে বেড়ালে তাকেও হত্যা করা যাবে।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

فكان في مضمون الآية إباحة قتل المفسد في الأرض. اهـ

“আয়াত বুঝাচ্ছে- যমিনে বিশৃংখলাকারীকে হত্যা করা বৈধ।”

- আহকামুল কুরআন: ২/৫০৫

ফাসাদ দুনিয়াবিও হতে পারে, দ্বীনিও হতে পারে।

দুনিয়াবি ফাসাদ, যেমন: চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, সন্ত্রাসী, খুন, ধর্ষণ, যাদু-টোনা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট করা, জনজীবন অতিষ্ট করে তোলা।

দ্বীনি ফাসাদ, যেমন: ইলহাদ, যান্দাকাহ্, নাস্তিকতা, বিদআত ইত্যাদি ছড়ানো।

এ উভয় ধরণের ফাসাদকারীকেই হত্যা করা যাবে, যদি হত্যা ব্যতীত তার অনিষ্ট দমন সম্ভব না হয়।

এক হাদিসে সমকামীকে হত্যার কথা এসেছে:

(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)
“কাউকে লূত আলাইহিস সালামের কাওমের মতো কাজ (অর্থাৎ সমকামিতা) করতে দেখলে যে করেছে এবং যার সাথে করেছে, তাদের উভয়কে হত্যা করে দাও।” - আবু দাউদ: ৪৪৬৪ , তিরিমিযি: ১৪৫৬

অর্থাৎ বিবাহিত হলেও হত্যা কর, অবিবাহিত হলেও হত্যা কর।

অন্য হাদিসে পশুর সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه)
“কাউকে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করতে দেখলে হত্যা করে দেবে।” - আবু দাউদ: ৪৪৬৬, তিরিমিযি: ১৪৫৫

অন্য হাদিসে মাহরাম মহিলার সাথে যিনাকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

(ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)

"যে ব্যক্তি তার মাহরামের সাথে যিনা করে, তাকে হত্যা করে দাও।" - তিরিমিযি: ১৪৬২

অর্থাৎ বিবাহিত হলেও, না হলেও।

আমাদের আইম্মায়ে কেরামের মতে এসকল হত্যার কোনটাই হদ নয়, বরং তা'যির। কাজেই সর্বাস্থায় এদের হত্যা করা জরুরী নয়। যারা এসব কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে দমন করতে হত্যার প্রয়োজন পড়বে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর যাদেরকে হত্যা ছাড়াই দমন করা সম্ভব, তাদেরকে হত্যা করা হবে না।

'আদদুররুল মুখতার' গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

(ويكون) التعزير (بالقتل). اهـ

"তা'যির হত্যার দ্বারাও হতে পারে।" - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬২

আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

رأيت في [الصارم المسلول] للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها. اهـ ... ومن ذلك ما سيذكره المصنف من أن للإمام قتل السارق سياسة أي إن تكرر منه. وسيأتي أيضا قبيل كتاب الجهاد أن من تكرر الخنق منه في المصر قتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل، وسيأتي أيضا في باب الردة أن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة له وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل. اهـ كلام ابن عابدين رحمه الله

“হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ‘আসসারিমুল মাসলূল’ গ্রন্থে দেখেছি: [হানাফিদের একটি মূলনীতি হলো- তাদের মতে যেসব অপরাধের শাস্তি হত্যা নয়; যেমন: ভারি বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য পথে সঙ্গম করা; যদি

ব্যক্তি থেকে তা একাধিকবার প্রকাশ পায়, তাহলে ইমামুল মুসলিমীন তাকে হত্যা করতে পারবেন। তদ্রূপ মাসলাহাত মনে করলে তিনি নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তিও দিতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ সকল অপরাধের বেলায় বর্ণিত হত্যাকে তারা এর উপর প্রয়োগ করেন যে, এতে তিনি মাসলাহাত রয়েছে মনে করেছেন। একে তারা 'সিয়াসতরূপে হত্যা' নাম দিয়ে থাকেন। এর সারকথা: যেসব অপরাধের অনুরূপ অপরাধে হত্যার বিধান রয়েছে, সেগুলো যখন বারংবার সংঘটিত হওয়ার দ্বারা গুরুতর অবস্থা ধারণ করবে, তখন সেগুলোতে তিনি তা'যিররূপে হত্যা করতে পারবেন।] হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য শেষ হল। ...

(শামী রহ. বলেন,) গ্রন্থকার সামনে যা উল্লেখ করবেন, সেটাও এই শ্রেণীভুক্তই। তা হল- ইমামুল মুসলিমীন সিয়াসতরূপে চোরকে হত্যা করতে পারবেন। অর্থাৎ যখন তার থেকে বারংবার চুরি প্রকাশ পাবে। কিতাবুল জিহাদের একটু আগে আলোচনা আসবে যে, যে ব্যক্তি থেকে শহরের অভ্যন্তরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার ঘটনা বারংবার ঘটবে, তাকে

সিয়াসতরূপে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা, সে যমিনে ফাসাদ করে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, যার অবস্থা এমন হবে- তাকে হত্যা করে দিয়ে তার অনিষ্ট দমন করা হবে। বাবুর রিদ্দাহয় আলোচনা আসবে- যাদুকর কিংবা এমন যিন্দিক, যে নিজ কুফরি অভিমতের দিকে লোকজনকে দাওয়াত দেয়: যদি তাওবা করার আগেই ধৃত হয় এরপর তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল হবে না বরং হত্যা করে দেয়া হবে। আর তাওবা করার পর ধৃত হলে তাওবা কবুল হবে। সামনে এও আসবে যে, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারীর কোন তাওবার সুযোগ নেই। আর সমকামিকে তা'যিররূপে কিভাবে হত্যা করা হবে তার আলোচনা আগে গেছে।" - রদ্দুল মুহতার: ৪/৬২-৬৩

সহজ কথা: যাকে হত্যা ছাড়া দমন সম্ভব না, তাকে হত্যা করে দমন করা হবে। এই হত্যা হদ হিসেবে নয়, তা'যির হিসেবে।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির); ১১- বিভিন্ন প্রকার তা’যির

কুরআন সুন্নাহয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত কয়েকটি তা’যির উপরে উল্লেখ করা হল, নতুবা তা’যিরের ধরণ অসংখ্য। যাকে যেভাবে শাস্তি দিলে দমন হবে, সেটাই তার তা’যির। তবে কাউকে যদি প্রহারের মাধ্যমে তা’যির করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সর্বোচ্চ কয়টি বেত্রাঘাত করা যাবে এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে।

এখন তা’যির সংক্রান্ত আইম্মায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি। তাতে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبى وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبى وأصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه فى جند المسلمين كالجندى المقاتل إذا فر من الزحف فان الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره نوع تعزير له وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له وكذلك قد يعزر

بالحبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا كما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر بمثل ذلك فى شاهد الزور. اهـ

“তা’যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণের কোন নির্ধারিত সীমা নেই। বরং প্রত্যেক এমন কথা ও কাজ কিংবা প্রত্যেক এমন কথা বা কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা ব্যক্তির কষ্ট হবে, সেটা দিয়েই তা’যির হতে পারে। কোন সময় ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে, ধমকি দিয়ে ও কঠোরতা করে তা’যির করা যায়। আবার কোন সময় তাওবা না করা পর্যন্ত বয়কট করে ও সালাম দেয়া বন্ধ রাখার মাধ্যমে করা যায়। এমনটা করা যায় যখন এটাই মাসলাহাত বলে মনে হয়। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম ঐ তিন সাহাবিকে বয়কট করেছিলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী ছিল।

কখনো নিজ পদ থেকে অপসারিত করে দেয়ার দ্বারাও তা’যির হতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম এভাবে তা’যির করতেন। আবার কখনো মুসলিম বাহিনিতে না নেয়ার মাধ্যমেও তা’যির হতে পারে; যেমন- যোদ্ধা সৈনিক যদি

যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। কেননা, ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ। আর তার প্রতিদান বন্ধ করে দেয়াও তার জন্য এক প্রকার তা'যির। তদ্রূপ আমীর যদি জঘন্য কিছু করে ফেলে, তাহলে তাকে তার নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করে দেয়া তার তা'যির। তেমনি কখনো কখনো বন্ধী করার মাধ্যমে তা'যির করা যেতে পারে, কখনো প্রহারের মাধ্যমে করা যেতে পারে, আবার কখনোও চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানোর মাধ্যমেও হতে পারে, যেমনটা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার সাথে এমনটা করার আদেশ দিয়েছেন।" - মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৪৪

এখানে তা'যিরের আরোও কয়েকটি পদ্ধতি পাওয়া গেল:

ছয়. শরীয়তসম্মত এমন কথা বলা, যার দ্বারা অপরাধীর কষ্ট হতে পারে।

সাত. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

আট. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কথা পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

নয়. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

দশ. উপদেশ দেয়া।

এগার. ধমক দেয়া।

বার. কঠোরতা করা।

তের. সালাম না দেয়া।

চৌদ্দ. পদ থেকে অপসারিত করে দেয়া।

পনের. সেনাবাহিনিতে না নেয়া।

ষোল. আমীরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া।

সতের. চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানো।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها وصغرها وبحسب حال المذنب في نفسه والتعزير منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام ومنه ما يكون بالحبس ومنه ما يكون بالنفي ومنه ما يكون بالضرب. اهـ

“তা’যিরের পরিমাণ, ধরণ ও সিফাত অপরাধের অবস্থাভেদে, অপরাধ ছোট ও বড় হওয়া ভেদে এবং অপরাধীর নিজের অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তা’যির হতে পারে ধমক দেয়া, তিরস্কার করা ও কথার মাধ্যমে। হতে পারে বন্দী করা ও এলাকা থেকে নির্বাসন দেয়ার মাধ্যমে। হতে পারে প্রহারের মাধ্যমে।” - আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ: ১/৩৮৪

এখানে আরেকটি পাওয়া গেল:

আটার. তিরস্কার করা।

‘আদদুররুল মুখতার’ গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

(و) التعزير (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي) وعليه مشايخنا زيلعي لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة بحر. اهـ

“তা’যিরের কোন নির্ধারিত পরিমাণ নেই, বরং তা কাযির বিবেচনার উপর ন্যস্ত। ... কেননা, এর উদ্দেশ্য- (অপরাধ থেকে) বিরত রাখা। আর লোকজনের অবস্থা এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।” - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের

সাথে ছাপা): ৪/৬৪

তিনি আরো বলেন,

(ويكون به و) بالحبس و (بالصفع) على العنق (وفرك الأذن، وبالكلام العنيف، وبنظر القاضي له بوجه عبوس، وشتم غير القذف). اهـ

“তা’যির হতে পারে প্রহারের দ্বারা, বন্দী করার দ্বারা, গর্দানে চপেটাঘাতের দ্বারা, কানমলা ও রূঢ় কথার দ্বারা, কাযি সাহেব তার প্রতি ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানোর দ্বারা, অপবাদ নয় এমন গালি দেয়ার দ্বারা।” - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬১

অবশ্য সারাখসী রহ. মুসলমানকে গর্দানে চপেটাঘাতের মাধ্যমে তা’যির করতে নিষেধ করেছেন। যিম্মিকে করলে করা যেতে পারে।

এখান থেকে আরোও পাওয়া গেল:

উনিশ. কানমালা।

বিশ. কাযি সাহেব ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানো।

একুশ. অপবাদ নয় এমন গালি দেয়া।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা তা'যিরের একুশটি পদ্ধতি পেলাম:

এক. বর্জন ও বয়কট।

দুই. নির্বাসন

তিন. বন্দী।

চার. প্রহার।

পাঁচ. হত্যা।

ছয়. শরীয়তসম্মত এমন কথা বলা, যার দ্বারা অপরাধীর কষ্ট হতে পারে।

সাত. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ করা, যার দ্বারা

তার কষ্ট হতে পারে।

আট. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কথা পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

নয়. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

দশ. উপদেশ দেয়া।

এগার. ধমক দেয়া।

বার. কঠোরতা করা।

তের. সালাম না দেয়া।

চৌদ্দ. পদ থেকে অপসারিত করে দেয়া।

পনের. সেনাবাহিনিতে না নেয়া।

ষোল. আমীরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া।

সতের. চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানো।

উনিশ. কানমলা।

বিশ. কাযি সাহেব ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানো।

একুশ. অপবাদ নয় এমন গালি দেয়া (ওহে আহমক!)।

এগুলো তা'যিরের কয়েকটি পদ্ধতি মাত্র। নতুবা এর কোন নির্ধারিত পরিমাণ ও পদ্ধতি নেই, যেমনটা অনেকবার বলা হয়েছে। যেখানে শরীয়তসম্মত যে পদ্ধতি কার্যকর মনে হবে সেটাই প্রয়োগ করা হবে। তবে কারো ক্ষেত্রে প্রহারের দ্বারা তা'যির উপকারী মনে হলে তখন সর্বোচ্চ কয়টি বেত্রাঘাত করা যাবে- সেটার একটা সীমারেখা আছে। সামনে এর বিবরণ আসছে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির); ১২- তা’যিরের সর্বোচ্চ পরিমাণ

তা’যিরের সর্বোচ্চ পরিমাণ

আমরা দেখেছি, তা’যিরের ভিত্তি কাযির ইজতিহাদের উপর, খাহেশাতের উপর নয়। তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে যাকে যে ধরণের ও যে পরিমাণ তা’যির করা প্রয়োজন মনে করেন ততটুকুই করবেন। এর চেয়ে কমও না, এর চেয়ে বেশিও না। কমও জায়েয হবে না, বেশিও জায়েয হবে না। কারণ, বেশি লাগালে সীমালঙ্ঘন হবে আবার কম লাগালে অপরাধী দমন হবে না। সীমালঙ্ঘনও জায়েয নয়, অপরাধীকে দমন না করে ছেড়ে দেয়াও জায়েয নয়। অতএব, কমও জায়েয নয়, বেশিও জায়েয নয়। এ হিসেবে তা’যিরের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নেই। অর্থাৎ এমন কোন পরিমাণ নেই যে, অপরাধী বিরত হয়ে গেলেও এর চেয়ে কম করা যাবে না; আবার এমন কোন পরিমাণও নেই যে, অপরাধী ঐ পরিমাণ শাস্তির পর বিরত হবে না বলে মনে হলেও তাকে এর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

হানাফি মাযহাবের অনেক কিতাবে আছে, তা’যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণ তিন বেত। তবে আমাদের আইম্মায়ে কেরাম স্পষ্ট বলেছেন, এই বক্তব্য সহীহ নয়। যে ধমকে বিরত হয়ে যাবে, তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে না। আবার যাকে এক বেত্রাঘাতে বিরত রাখা যাবে মনে হয়, এর বেশি দরকার হবে না- তাকে এর বেশি লাগানো যাবে না। অতএব, তিন বেত্রাঘাতের বক্তব্য সহীহ নয়।

তবে যাকে দশ বেতের কমে বিরত রাখা যাবে না, তার তা’যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণ- দশ বেত্রাঘাত। যাকে বিশটা দরকার, তার জন্য বিশটাই সর্বনিম্ন। যার ত্রিশটা দরকার, তার ত্রিশটা। এর চেয়ে কম লাগানো জায়েয হবে না।

তদ্রূপ, যাকে দুই দিন বন্দী করে রাখলেই বিরত হয়ে যাবে, তাকে এর বেশি সময় বন্দী রাখা জায়েয হবে না। আবার যাকে এক বৎসরের কমে দমন সম্ভব নয়, তার সর্বনিম্ন তা’যির এক বৎসর। তাকে এক বৎসরের আগে ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না। অতএব, যাকে যে পরিমাণ বন্দী রাখা দরকার, কাযি সাহেব তাকে সে পরিমাণই বন্দী রাখবেন। অন্যান্য সকল তা’যিরের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তবে বিশেষভাবে বেত্রাঘাতের দ্বারা তা'যিরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কতটি বেত লাগানো যাবে এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক রহ. এর মতে এর কোন সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যাকে বিরত রাখতে যত পরিমাণ বেত লাগানো দরকার তাকে সে পরিমাণই লাগানো যাবে। একশো দরকার হলে একশো, দু'শো দরকার হলে দু'শো, চারশো দরকার হলে চারশো।

তবে অন্যান্য আইম্মায়ে কেরামের মতে বেত্রাঘাতের একটা সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত আছে। আবু হানিফা রহ. এর মতে এর পরিমাণ ঊনচল্লিশ (৩৯)। অতএব, তা'যিররূপে কাউকে ঊনচল্লিশ বেতের অধিক লাগানো যাবে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ ঊনচল্লিশ বেতে বিরত না হয়, তাহলে তার ব্যাপারে কি করা হবে? ঊনচল্লিশ লাগানোর

পর কি ছেড়ে দেয়া হবে?

উত্তর:

না ছেড়ে দেয়া হবে না। বরং তাকে বিরত রাখতে বেত্রাঘাতের পরিবর্তে অন্য কোন শাস্তি বেছে নেয়া হবে। যেমন- বেত্রাঘাতের পর জেলে ভরে রাখা হবে কিংবা নির্বাসন দিয়ে দেয়া হবে কিংবা লোকজনকে তাকে বয়কট করার আদেশ দেয়া হবে, যাতে সংকীর্ণতার শিকার হয়ে সে সংশোধন হয়ে যায়। অতএব, বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩৯ হওয়ার অর্থ এই নয়- এর অতিরিক্ত কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। বরং এর অর্থ: বেত্রাঘাত ৩৯- এর অধিক লাগানো যাবে না, তবে ৩৯- এ বিরত না হলে আর বেত্রাঘাত না করে বরং অন্য কোন শাস্তি বেছে নেয়া হবে।

দ্বিতীয়ত: কারো অপরাধ যদি অনেক হয়, আর প্রত্যেকটা অপরাধের কারণে তা’যিরের প্রয়োজন পড়ে, যার ফলে সবগুলো বেত্রাঘাতের পরিমাণ সমষ্টিগতভাবে ৩৯- এর অধিক হয়ে যায়: তাহলে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। বর্ণিত আছে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তার আংটির

নকশা নকল করে বাইতুল মাল থেকে সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার কারণে মা'ন ইবনে যায়েদাকে তিনি দু'শো বেত্রাঘাত করেছেন, সাথে বন্দীও করেছেন এবং নির্বাসনও দিয়েছেন। কারণ, তার এই অপরাধ অনেকগুলো অপরাধের রূপ নিয়েছে। যেমন:

- আংটির নকশা নকল করা।
- অন্যায়ভাবে বাইতুল মালের সম্পদ হাতিয়ে নেয়া।
- অপরাধীদের জন্য এই অপরাধের রাস্তা খোলে দেয়া।

কেননা, তার দেখাদেখি অন্যরাও বাইতুল মালের সম্পদ হাতিয়ে নিতে দায়িত্বশীলদের আংটির নকশা নকল করার পথ ধরতে পারে ইত্যাদি।

যেহেতু তার অপরাধ অনেকগুলো অপরাধের রূপ নিয়েছে এ কারণে সবগুলোর তা'যিররূপে দু'শো লাগানো হয়েছে।
[বিস্তারিত ফাতহুল কাদীর ও রদ্দুল মুহতার, বাবুত তা'যির দেখুন।]

অতএব, ৩৯- এর অধিক লাগানো যাবে না ঐ সময়, যখন অপরাধ একটা হবে। যেমন- কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য কুকর্ম করলো

(যেমন- জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া ইত্যাদি)। তার শাস্তি কি তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। এখানে তা'যির করতে হবে। তবে এই তা'যিরের পরিমাণ হানাফি মাযহাব মতে ৩৯ বেতের অধিক হতে পারবে না। তবে যদি এর দ্বারা সে পরবর্তীতে এসব কুকর্ম থেকে বিরত হবে না বলে মনে হয়, তাহলে তাকে জেলে দেয়া যেতে পারে কিংবা মুনাসিব মতো অন্য কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির অপরাধ যদি অনেকগুলো হয়, যেমন:

- কাউকে গালি দিয়েছে,
- কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে,
- কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছে,
- কোন মহিলার সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য কুকর্ম করেছে,
- অন্যায়ভাবে কারো টাকা হাতিয়ে নিয়েছে,
- জুয়া খেলেছে ইত্যাদি;

এমতাবস্থায় তাকে সবগুলোর বিপরীতে যদি বেত্রাঘাত করা হয়, তাহলে তার সংখ্যা ৩৯- এর চেয়ে অনেক বেশি হবে। এতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, এখানে এক অপরাধের

বিপরীতে বেত্রাঘাত হচ্ছে না, অনেকগুলো অপরাধের বিপরীতে হচ্ছে। তবে বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে- যেন তার মৃত্যু না ঘটে যায় কিংবা কোন অঙ্গ নষ্ট না হয়ে যায়।

সারকথা এই দাঁড়ালো:

ꙍ তা'যির কাযির ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। তিনি খাহেশাতের বশবর্তী না হয়ে ইজতিহাদের ভিত্তিতে যাকে যেমন মুনাসিব মনে করেন তা'যির করবেন।

ꙍ তা'যিরের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যাকে দমন করতে যে পরিমাণ শাস্তি দরকার, সেটাই তার জন্য সর্বনিম্ন তা'যির। এর চেয়ে কম শাস্তি জায়েয হবে না। তদ্রূপ, যে পরিমাণ শাস্তির মাধ্যমে অপরাধী দমন হয়ে যাবে, এর বেশি লাগবে না মনে হয়- সেটা তার জন্য সর্বোচ্চ তা'যির। এর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

ꙍ হানাফি মাযহাব মতে তা'যিরে বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩৯। এর বেশি বৈধ নয়। তবে অপরাধ যদি অনেক হয় এবং প্রত্যেকটার জন্য তা'যিরের দরকার পড়ে, তাহলে সবগুলোর

সমষ্টি ৩৯- এর অধিক হতে কোন সমস্যা নেই। তদ্রূপ, যেক্ষেত্রে ৩৯- এর অধিক বৈধ নয়, সেক্ষেত্রেও যদি অপরাধী বিরত হবে না বলে মনে হয়, তাহলে বেত্রাঘাতের সাথে অন্য শাস্তি যোগ করা হবে।